তাওহীদ পন্থীদের নয়নমণি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৭তম অধ্যায় - কোনো সৃষ্টিকে অশুভ মনে করা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে (باب ما جاء في التطير)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ আব্দুর রাহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ)

কোনো সৃষ্টিকে অশুভ মনে করা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে - ১

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ কোনো সৃষ্টিতে কুলক্ষণ আছে বলে বিশ্বাস করা হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এমন ধারণাকারীর ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

الطيرة (তিয়ারাহ) শব্দের ‘তোয়া’ বর্ণে যের ও ‘ইয়া’তে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। তবে ‘ইয়া’ বর্ণে সাকীন দিয়েও পড়া যায়। এটি تطير طيرة শব্দ থেকে ইসমে মাসদার। জাহেলী যুগের লোকেরা سوانح এবং بوارح তথা পাখি, হরিণ এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর চলাচলকে মঙ্গল-অমঙ্গলের লক্ষণ মনে করত। এ সমস্ত বস্তুকে অমঙ্গলকর মনে করার কারণে এগুলো তাদেরকে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হতে রুখে দিত। ইসলামী শরীয়ত এ খারাপ আকীদাহকে অস্বীকার করেছে এবং এর কঠোর প্রতিবাদ করেছে। ইসলাম সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, কল্যাণ অর্জনে কিংবা অকল্যাণ দূর করণে এগুলোর কোনো প্রভাব নেই।

ইমাম মাদায়েনী (রঃ) বলেনঃ আমি রুবা ইবনুল আজ্জাজকে জিজ্ঞেস করলামঃ سانح কাকে বলে? তিনি জবাবে বললেনঃ যে (পাখি বা অন্য কোনো জন্তু) তোমাকে পিছে ফেলে ডান দিকে অতিক্রম করে, তা হচ্ছে ‘সানিহ’। আমি আরও জিজ্ঞাসা করলামঃ بارح কাকে বলে? তিনি জবাবে বললেনঃ যে পাখি বা অন্য কোনো প্রাণী তোমাকে পিছে রেখে বাম দিকে অতিক্রম করে, তা হচ্ছে, ‘বারিহ’। যে প্রাণী বা পাখি তোমার সামনের দিক থেকে আগমণ করে, তা হচ্ছে الناطِح বা النَطِيح। আর যা তোমার পিছন দিক থেকে আগমণ করে, তা হচ্ছেالقاعِد বা القَعِيْد।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“অতঃপর যখন তাদের শুভদিন ফিরে আসতো, তখন তারা বলতো এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর যদি তাদের নিকট অকল্যাণ এসে উপস্থিত হতো, তখন তা মূসা এবং তার সঙ্গীদের অশুভ কারণরূপে মনে করতো। শুনে রাখো! তাদের অকল্যাণ তো আল্লাহ্‌র কাছেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ”। (সূরা আরাফঃ ১৩১)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ফেরাউন সম্প্রদায় যখন সুখ-সাচ্ছন্দে থাকতো অর্থাৎ তারা যখন প্রশস্ত রিযিক প্রাপ্ত হত এবং সুস্বাস্থ্য উপভোগ করত তখন বলতোঃ আমরা ইহার হকদার। অর্থাৎ আমরাই ইহা পাওয়ার অধিক উপযোগী। মুজাহিদ এবং অন্যান্য আলেম এভাবেই এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। আর যখন তারা মসীবত ও অনাবৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত হত, তখন তারা বলতোঃ মুসা এবং তাঁর সাথীদের কারণেই এ রকম হয়েছে। তাদের অমঙ্গল আমাদেরকেও স্পর্শ করেছে। আল্লাহ তাআলা তখন বললেনঃ তাদের অমঙ্গল আল্লাহর পক্ষ হতেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাদের মন্দ কিসমত আল্লাহর পক্ষ হতেই। তাদের কুফরী

করার কারণে এবং আল্লাহ তাআলার আয়াত এবং তাঁর রাসূলদেরকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতেই তাদের অমঙ্গল এসেছে।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ "কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ"ঃ অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ লোকই মূর্খ। তারা কিছুই জানত না। তারা যদি বুঝত এবং অনুধাবন করত, তাহলে অবশ্যই জানতে পারত যে, মুসা (আঃ) তাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাতে বরকত ও কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু নেই। সুতরাং সৌভাগ্য ও সাফল্য ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাঁর কথা মান্য করেছে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

"রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে বলেই কি তোমরা এ কথা বলছো? বস্তুতঃ তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়"। (সূরা ইয়াসিনঃ ১৯)

ব্যাখ্যাঃ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ "রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই"ঃ আয়াতের অর্থ হচ্ছে তোমাদের নসীব এবং তোমাদেরকে যে অকল্যাণ স্পর্শ করেছে, তা তোমাদের সাথেই রয়েছে। এগুলো তোমাদের খারাপ কর্ম, কুফরী এবং উপদেশ দানকারীদের বিরোধীতা করার কারণেই। তা কোনোভাবেই আমাদের কারণে নয়; বরং তা তোমাদের সীমা লংঘন ও শত্রুতার কারণেই। সুতরাং যালেম ও সীমালংঘনকারীর বদনসীব তার সাথেই লেগে আছে। যে অকল্যাণই তাদেরকে স্পর্শ করেছে, তা তাদের যুলুম ও সীমালংঘনের কারণেই এবং তা আল্লাহর ফয়সালা, নির্ধারণ, হিকমত এবং ইনসাফ অনুপাতেই হয়েছে।

أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ "তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে বলেই কি তোমরা এ কথা বলছো?" অর্থাৎ আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি এবং তোমাদেরকে আল্লাহর তাওহীদ মেনে চলার আদেশ দিয়েছি বলেই কি তোমরা এ কথা বলছ? আসল কথা হচ্ছে তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়"।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ «لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ» "রোগের কোনো সংক্রামণ শক্তি নেই, পাখি উঁড়িয়ে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করারও কোনো ভিত্তি নেই। 'হামাহ' তথা হুতুম পেচাঁর ডাক শুনে অশুভ নির্ধারণ করা ভিত্তিহীন। সফর মাসেরও বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। অর্থাৎ সফর মাসকে বরকতহীন মনে করা ঠিক নয়। মুসলিমের হাদীছে 'নক্ষত্রের কোনো প্রভাব নেই এবং ভূত-প্রেত বলতে কিছুই নেই'- এ কথাটুকু অতিরিক্ত রয়েছে"।[1]

ব্যাখ্যাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কোনো রোগ নিজে নিজে সংক্রামিত হয়না। ইমাম আবুস সাআদাত (রঃ) বলেনঃ কোনো রোগীর শরীর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কোনো সুস্থ ব্যক্তির শরীরে লেগে যাওয়ার নাম عدوى (আদ্ওয়া)। রোগীর শরীরে যে রোগ রয়েছে তা যখন অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তির শরীরে স্থানান্তরিত হয়, তখন বলা হয়أعداه الداء يعديه إعداء অর্থাৎ সে অমুকের শরীরে রোগ সংক্রামিত করেছে।[2]

لاطيرة পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করার কোনো ভিত্তি নেইঃ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ لاطيرة শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। نفي (নাফী) অর্থে অর্থাৎ 'তিয়ারা'-এর প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার জন্য অথবা نهي (নাহী) অর্থে অর্থাৎ তিয়ারা থেকে নিষেধ করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। নিষেধাজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে, لاتطيروا তোমরা পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ণয়

করোনা। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীঃ

«لاعَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ»

প্রমাণ করে যে, এখানে নাফী উদ্দেশ্য এবং এখানে ঐ সমস্ত কুসংস্কারকে বাতিল করা উদ্দেশ্য, যাতে জাহেলীয়াতের লোকেরা লিপ্ত ছিল। তাই এখানে نهي (নিষেধাজ্ঞা)-এর চেয়ে نفي উদ্দেশ্য হওয়াই অধিক বাঞ্চনীয়। কেননা নফী তিয়ারাকে বাতিল প্রমাণিত করে এবং তাকে প্রভাবহীন বলে ঘোষণা করে। আর নাহী শুধু তা থেকে বিরত থাকার আহবান জানায়।

ইকরিমা (রঃ) বলেনঃ আমরা একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় একটি পাখি ডাকাডাকি করতে করতে অতিক্রম করছিল। তখন এক লোক বললঃ ভাল হোক! ভাল হোক! আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেনঃ ভাল বা খারাপ কোনটাই না হোক। ইবনে আববাস তাদের কথার দ্রুত প্রতিবাদ করলেন। যাতে করে কল্যাণ ও অকল্যাণের ব্যাপারে ঐ পাখির কোনো প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস না করা হয়।

একদা তাউস (রঃ) একজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে কোনো এক সফরে বের হলেন। তখন একটি কাক চিৎকার করে ডাকছিল। তখন তাউসের সাথী বলতে লাগলঃ ভালো হোক। এ কথা শুনে তাউস বললেনঃ এই কাকের নিকট কোনো ভালো আছে কী? এখন থেকে তুমি আমার সাথে চলবেনা।[3]

وَلا هامة হামাহ (হুতুম পেচাঁর) ডাক শুনে অশুভ নির্ধারণ করারও কোনো ভিত্তি নেইঃ ইমাম ফার্রা বলেনঃ হামাহ রাতের পাখিসমূহের অন্যতম। সম্ভবতঃ তিনি হুতুম পেঁচা উদ্দেশ্য করেছেন।

ইবনুল আরাবী বলেনঃ লোকেরা হুতুম পেঁচাকে (পেঁচার ডাককে) কুলক্ষণ মনে করত। কারো ঘরের উপর (ছাদে) এটি বসলে সে বলতঃ এটি আমার অথবা আমার পরিবারের অন্য কারো মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে এসেছে। উপরোক্ত হাদীছ এ খারাপ আকীদাহর প্রতিবাদ করেছে এবং তাকে বাতিল করে দিয়েছে।

وَلا صَفَرَ সফর মাসেরও বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট নেইঃ আবু উবাইদ স্বীয় কিতাব ‘গারীবুল হাদীছ’এ ‘রুবা’ থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ সফর হচ্ছে এক প্রকার সাপ, যা মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তুর পেটে হয়ে থাকে। আরবরা মনে করতঃ এটি খোস-পাঁচড়ার চেয়েও অধিক দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়। এখানে এ ধারণারই প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা ধারণা করত এটি একটি সংক্রামক রোগ। সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম বুখারী এবং ইবনে জারীর (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

অন্যরা বলেনঃ সফর দ্বারা হিজরী সফর মাস উদ্দেশ্য। এখানে আহলে জাহেলীয়াত তথা জাহেলী যামানার মুশরিকদের ঐ খারাপ অভ্যাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যাতে তারা লিপ্ত ছিল। তারা হারাম মাসকে পিছিয়ে দিত। তারা মুহার্রাম মাসকে হালাল মাস হিসাবে গণ্য করত এবং তার স্থলে সফর মাসকে হারাম মাস হিসাবে গণনা করত। এটি ইমাম মালেক (রঃ)এর অভিমত।

ইমাম আবু দাউদ মুহাম্মাদ বিন রাশেদ হতে বর্ণনা করেছেন, রাশেদ অন্য এক ব্যক্তির নিকট হতে শ্রবণ করে বলেনঃ জাহেলী যামানার লোকেরা সফর মাসকে অকল্যাণের মাস মনে করত। তারা বলতঃ এটি খুবই অশুভ মাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ ধারণার মূলোৎপাটন করেছেন।

ইবনে রজব বলেনঃ সম্ভবতঃ এ মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। জাহেলীয়াতের লোকেরা সফর মাসকে ঐ রকমই

অমঙ্গলময় মাস মনে করত, যেমন তারা শাওয়াল মাসে বিবাহ করাকে অকল্যাণকর মনে করত।

ولاغول ভূত-প্রেত বলতে কিছুই নেইঃ غول শব্দের ‘গাইন’ বর্ণে পেশ দিয়ে পড়তে হবে।[4] এটি ভূত-প্রেতের নাম বিশেষ। এর বহুবচন হচ্ছে,أغوال ও غيلان

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে এবং আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে, ভূত-প্রেত তাকে পথ ভুলাতে পারেনা এবং তার কোনো ক্ষতিও করতে পারেনা। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যখন ভূত-প্রেত দেখা দেয় তখন তোমরা দ্রুত আযান দেয়া শুরু কর। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যিকিরের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি প্রতিহত করো।[5]

বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ قَالُوا ومَاالفَالُ؟ قال الْكَلِمَةُ الْطَّيِّبَةُ»

‘‘ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে আমি ‘ফাল’ পছন্দ করি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ফাল’ কী? তিনি বললেন, ‘উত্তম কথা’।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ الْكَلِمَةُ الْطَّيِّبَةُ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি নেক ফাল গ্রহণ করা তথা উত্তম কথা শুনতে পছন্দ করতেন এবং ভালো কিছু শুনে খুশী হতেন।[6] ভালো কথা শুনে ভালো কিছু কামনা করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়।

আবুস্ সাআদাত বলেনঃ ভালো ও মন্দ উভয় অর্থেই فال (ফাল) ব্যবহার হয়। আর طيرة শুধু অমঙ্গলময় বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তবে কখনো কখনো মঙ্গলের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ফাল’ কী? তিনি বললেন, উহা হলো উত্তম কথাঃ এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে ফাল পছন্দনীয় ছিল। আর ফাল নিষিদ্ধ ‘তিয়ারা’র অন্তর্ভূক্ত নয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেনঃ নেক ফাল[7] গ্রহণ করা এবং তা পছন্দ করা কোনোভাবেই শির্কের অন্তর্ভূক্ত নয়। এটি মানুষের স্বভাব ও ফিতরাতের দাবীর বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মানুষের স্বভাব সব সময় এমন বস্তুর দিকে ধাবিত হয়, যা তার চাহিদা ও সৃষ্টিগত স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে এমন একটি স্বভাব স্থাপন করেছেন, যার মাধ্যমে সে ভালো নাম পছন্দ করে, ভালো নাম শুনে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে এবং ভাল নামের প্রতি তার অন্তর ঝুকে পড়ে। এমনি মানুষ ‘ফালাহ’ (কল্যাণ), ‘সালাম’ (শান্তি-নিরাপদ), ‘নাজাহ’ (সফলতা) ‘তাহনিআহ’ (মুবারকবাদ), ‘বুশরাহ’ (সুখবর), ফাউয, (বিজয়), যুফ্র (জয়লাভ) ইত্যাদি শুনে খুশী হয় এবং আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। আর যখন এগুলোর বিপরীত শুনে, তখন তার অন্তরে এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়। অতঃপর তাকে চিন্তিত করে তুলে এবং অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হয়। সেই সঙ্গে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা করার সাহস ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে সে দুনিয়াতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তার ঈমানে ঘাটতি আসে এবং কখনো শির্কেও লিপ্ত হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রঃ) উকবা বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ‘তিয়ারাহ’ (কুলক্ষণ) সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেনঃ এগুলোর

মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে নেকফাল গ্রহণ করা। বদ ফাল কোনো মুসলিমকে কাজে অগ্রসর হওয়া থেকে প্রতিহত করতে পারেনা। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখে তখন সে যেন বলেঃ

«اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ»

“হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কেউ কল্যাণ আনয়ন করতে পারেনা। তুমি ছাড়া অন্য কেউ অকল্যাণ প্রতিহত করতে সক্ষম নয়। তোমার সাহায্য ব্যতীত কেউ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে পারেনা এবং তোমার তাওফীক ও শক্তি ব্যতীত সৎ আমল করাও সম্ভব নয়।[৪]

ব্যাখ্যাঃ কিতাবুত তাওহীদের কপিসমূহে রয়েছে যে, এ হাদীছের রাবী ‘উকবা বিন আমের’। সঠিক হচ্ছে উরওয়া বিন আমের। ইমাম আবু দাউদ, ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং অন্যরা এ রকমই বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন মক্কী। তার বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) এ হাদীছ বর্ণনায় বলেনঃ عن عروة بن عامر القرشي অর্থাৎ উরওয়া বিন আমের আলকুরাশী হতে বর্ণিত। অন্যরা বলেনঃ তিনি হচ্ছেন জুহানী। তিনি সাহাবী ছিলেন কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মাওয়ারদী বলেনঃ তিনি ছিলেন সাহাবী। ইবনে হিববান তাকে নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীদের মধ্যে গণনা করেছেন। ইমাম মিয্যী বলেনঃ বিশুদ্ধ মতে উরওয়াহ বিন আমের সাহাবী নন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেক ফালকেও তিয়ারার মধ্যে গণনা করেছেন। তবে তিয়ারার মধ্যে ফাল হচ্ছে সর্বোত্তম তিয়ারা। এ জন্যই তিনি তিয়ারাকে বাতিল করেছেন। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, ফালও তিয়ারার অন্তর্ভূক্ত। তবে তা তিয়ারা থেকে উত্তম। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাল ও তিয়ারার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এ দু'টির একটিতে উপকার এবং অন্যটিতে ক্ষতি থাকার কথাও বর্ণনা করেছেন।

বদ ফাল তথা কুলক্ষণ কোন মুসলিমকে উদ্দেশ্য হতে প্রতিহত করতে পারেনা। ইমাম তিবী বলেনঃ এ হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফের এর বিপরীত। অর্থাৎ কুলক্ষণ তাকে উদ্দেশ্য হতে বিরত রাখে।

لاَ يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَ أَنْتَ তুমি ছাড়া অন্য কেউ কল্যাণ আনয়ন করতে পারেনা। তুমি ছাড়া অন্য কেউ অকল্যাণ প্রতিহত করতে পারেনা। অর্থাৎ ‘তিয়ারা’ কল্যাণ আনয়ন করতে পারেনা এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখেনা। হে আল্লাহ! একমাত্র তুমিই কল্যাণ করার মালিক এবং অকল্যাণ দূর করতে সক্ষম। এখানে الحسنات বলতে আল্লাহর নেয়ামত এবং السيئات বলতে মসীবত উদ্দেশ্য। সুতরাং কল্যাণ অর্জন করতে এবং অকল্যাণ দূর করতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর অন্তর দিয়ে ভরসা করাকে বাতিল করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে তাওহীদ। উপরোক্ত দুআটি ঐ ব্যক্তির জন্য খুবই উপযুক্ত, যার অন্তরে বদ ফালের লক্ষণ তৈরী হয়েছে। দুআর মধ্যে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কুলক্ষণ কোনো উপকার করতে পারেনা এবং অকল্যাণকে প্রতিহতও করতে পারেনা। যে ব্যক্তি কোনো বস্তুতে অশুভ থাকার বিশ্বাস রাখবে, তাকে মুশরিক হিসাবে গণ্য করা হবে।

وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হওয়াকে حول বলা হয়। একমাত্র আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছা ব্যতীত এটি সম্ভব নয়। এখানে আল্লাহ তাআলার শক্তি এবং ইচ্ছা ব্যতীত অন্যান্য সকল শক্তি ও ইচ্ছাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটি তাওহীদে রুবুবীয়াতের অন্তর্ভূক্ত। এটি তাওহীদুল উলুহীয়াতেরও দলীল। সকল প্রকার এবাদত কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য সম্পাদন করার নামই হচ্ছে তাওহীদুল উলুহীয়াহ।

একেةتوحيد القصد والإرادة (তাওহীদুল কাসদ ওয়াল ইরাদা) বলা হয়। এর ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

ফুটনোট

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কুষ্ঠরোগ।

[2] - আমাদের সমাজের বেশ কিছু মানুষ কিছু কিছু রোগকে ছোয়াচে রোগ বলে থাকে। মূলতঃ কোনো রোগই নিজস্ব ক্ষমতায় ছোয়াচে হয়না। কেননা কোন রোগেরই এমন কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নেই, যার ফলে রোগটি একজনের শরীর ছেড়ে অন্যজনের শরীরে চলে যেতে পারে। মূলত রোগ-ব্যাধি আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয় এবং সংক্রমণও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। সুতরাং রোগীর পাশে গেলেই যে রোগী হয়ে যাবে এই ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। তবে যেসব রোগজীবাণু ডাক্তারী শাস্ত্র দ্বারা সংক্রামক বলে স্বীকৃত, সেগুলো কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় সংক্রামিত হয়ে থাকে, নিজ ক্ষমতা বলে নয়। তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীর কাছে যেতে মানা করেননি; বরং হাদীছে কুদসীতে আল্লাহর ভাষায় বলা হয়েছে, তার কাছে গেলে সেখানে আল্লাহকে পাওয়া যাবে তথা তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া যাবে। ফলে ইসলামী রীতি অনুযায়ী একজন মুসলিম রোগী দেখতে যাবে। এতে তার উপর আরোপিত রোগীর হক আদায় হবে এবং হাদীছে বর্ণিত বাক্যে রোগীর জন্য এবং নিজের হেফাজতের জন্য দুআ করারও সুযোগ পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীর কাছে গিয়ে এই দুআ পাঠ করতেনঃ

«أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»

“কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রভু! নিরাময় দান কর। তুমিই নিরাময় দানকারী। তোমার নিরাময় দানই আসল নিরাময়। তুমি এমন নিরাময় দান কর, যা কোন রোগই অবশিষ্ট রাখবে না” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ কেউ যদি রোগে আক্রান্ত কোন লোককে দেখে এই দুআটি পাঠ করে তবে সেই রোগটি তাকে কখনই আক্রমণ করবেনা, তা যত বড়ই হোক না কেন। দুআটি হচ্ছে এইঃ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً»

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে ঐ রোগ থেকে হেফাজত করেছেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন এবং আমাকে অনেক মানুষের উপর বিশেষ ফযীলত দান করেছেন”।

[3] - বাংলাভাষী মুসলিমদের মধ্যেও এ ধরণের কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সমাজের অনেক লোকই কাকের ডাককে অশুভ মনে করে। তাদের ধারণা, কাক যখন কারো ঘরের চালে অথবা বাড়িঘরের আশপাশের গাছের ডালে বসে এবং ডাকাডাকি করে, তখন পরিবারের কারো মৃত্যু বা অকল্যাণ হয়। এমনি আরো কতিপয় পাখি ও প্রাণীর ডাককে অমঙ্গলের লক্ষণ মনে করে। ইসলাম এ জাতিয় বিশ্বাস ও ধারণার কড়া প্রতিবাদ করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক একমাত্র আল্লাহ। পশু-পাখির ডাক ও চলাচলের মধ্যে কোনো

কল্যাণ বা অকল্যাণ নেই।

[4] - গাইন বর্ণে যবর দিয়ে غَول))ও পড়া যায়।

[5] - মুসনাদে আহমাদ। ইমাম আলবানী (রঃ) এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে যঈফা, হাদীছ নং- ১১৪০।

আলেমগণ বলেনঃ আরবরা মনে করত জনমানবহীন অঞ্চল ও মরুপথ দিয়ে যখন মানুষ অতিক্রম করত তখন তাদের সামনে ভূত-প্রেত তথা শয়তানেরা বিভিন্ন আকার ধারণ করে প্রকাশ হত। শয়তানেরা বিভিন্ন রং ধারণ করত এবং পথিককে পথ ভুলিয়ে দিত। অতঃপর মেরে ফেলত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবদের এ ধারণাকে খন্ডন করেছেন। অন্য একদল আলেম বলেনঃ এখানে ভূত-পেত্নীর অস্থিত্বকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং এই হাদীছে ভূত-প্রেতের বিভিন্ন আকার ধারণ এবং মানুষকে রাস্তা ভুলিয়ে দেয়া ও মেরে ফেলার ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, গাওল বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ এগুলো কাউকে পথ ভুলাতে ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনা।

অবাধ্য ও অশান্ত শিশুদেরকে শান্ত করার জন্য প্রাচীনকালে শিশুদেরকে ভূতের গল্প শুনানো হত এবং তাদেরকে ভয় দেখানো হত। বলা হতঃ শান্ত না হলে ভূত আসবে অথবা ভূতে ধরে নিয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ যেই গল্পটি বলা হত, তা হচ্ছে ভূত একটি অদ্ভুত জন্তু। কোন মানুষের সামনে ভূত প্রকাশিত হলে সে যদি অস্ত্র দিয়ে একটি আঘাত করতে পারে, তাহলে এক আঘাতেই ভূত মারা যায়। মুমূর্ষ অবস্থায় সেই ভূত মানুষকে আরেকবার আঘাত করতে বলে। মানুষ যদি ভূতের আবেদন অনুযায়ী দ্বিতীয়বার আঘাত করে, তাহলে ভূত দ্বিতীয়বার জীবন লাভ করে এবং আঘাতকারীর নিকট হতে প্রতিশোধ নেয়।

আরো প্রচলিত আছে যে, ভূতের চোখে দীর্ঘ ছিদ্র রয়েছে। কোন মানুষের দিকে যখন সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়, তখন ভূতের চোখ থেকে আগুন বের হয় এবং মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়।

কোনো কোনো দেশের মানুষের মাঝে আরো প্রচলিত রয়েছে যে, তারা প্রতি রাতে ঘরের বাইরে কিছু খাদ্য রেখে দেয়। তারা বিশ্বাস করে গভীর রাতে ভূত এসে তা খেয়ে যাবে। কারণ ভূতেরা খাদ্যের সন্ধানে বাড়িঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।

কোন কোন মানব সমাজে এমনি আরও অনেক কুসংস্কারপূর্ণ গল্প ছড়িয়ে আছে যে, ভূতের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে বাড়িঘরের বাইরে প্রচুর তিসির দানা ফেলে রাখা। কেননা ভূতেরা প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করে। আরো প্রচলিত আছে যে, ভূতেরা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। পুরুষ ভূত মহিলা ভূতের চেয়ে ভিন্ন আকৃতির নয়। তারা বিভিন্ন আকার-আকৃতিও ধারণ করতে সক্ষম।

কোন কোন সমাজের মানুষের মধ্যে আরো প্রচলিত আছে যে, ভূত হচ্ছে দুষ্ট জিনদেরই একটি শ্রেণী। তাদের

আকৃতি ভয়াবহ এবং তারা মানুষের উপর সর্বদা আক্রমণমুখী ও রাগান্বিত থাকে। পথ চলার সময় তারা মানুষকে আটকিয়ে ফেলে এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করে ও সুযোগ পেলেই মানুষকে গিলে ফেলে।

আরো প্রচলিত আছে যে, ভূত (রাক্ষস) মানুষ এবং জিনের গোশত খায়। প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ইবনে মুকাফফা তার 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' গ্রন্থে সিন্দাবাদ ও সাইফুল মুলুকের গল্পের মতই অনেক ভূতের গল্প বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, ভূতেরা কবরস্থানের চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করে এবং মৃতদের লাশ খায়।

ভূত, জিন, রাক্ষস ইত্যাদি সম্পর্কে আরও অনেক কাল্পনিক কিচ্ছা শুনা যায়। এগুলোকে মূর্খরা বিশ্বাসও করে থাকে। মূলত এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

বাংলাভাষীদের মধ্যেও ভূতের গল্প শুনা যায়। হিন্দুদের সংস্কৃতির বিরাট অংশ জুড়ে আছে ভূত, রাক্ষস এবং প্রেত-পেত্নীর আরো অসংখ্য কাহিনী। বাংলা সাহিত্যেও ভুত-প্রেতের অনেক গল্প রয়েছে। বাংলার কবি-সাহিত্যিকগণও ভূত-প্রেত ও প্রেতাত্মাকে উপকরণ করে কাব্য ও সাহিত্য রচনা করেছেন। যার কারণে বাংলাভাষীদের মধ্যে ভূতের গল্পের শেষ নেই।

বাংলার মুসলিম সমাজও এ জাতীয় কুসংস্কার থেকে খালী নয়। আমাদের মুসলিম-পিতামাতাগণও শিশুদেরকে ঘুম পাড়ানোর জন্য এবং দুষ্টামি থেকে শান্ত করার জন্য যখন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করার পরও ব্যর্থ হন, তখন এক রকম বাধ্য হয়েই ভূতের গল্প শুনাতে থাকেন এবং বলে থাকেন শান্ত না হলে কিংবা না ঘুমালে এখনই ভূত আসবে এবং ধরে নিয়ে যাবে, ধরে নিয়ে ভূত এই এই ....করবে, ভূতের এই এই রূপ, এই এই গুণ ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

এ জাতিয় সকল কিচ্ছাই কাল্পনিক ও বানোয়াট। শিশুদেরকে এ ধরণের ঘটনা শুনানো থেকে বিরত থাকা উচিৎ। শিশুদেরকে জিন, ভূত, প্রেত-পেত্নী ইত্যাদির ভয় না দেখিয়ে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা এবং সাহস ও বীরত্বের ঘটনা শুনানো উচিৎ।

ইসলাম এ জাতিয় কুসংস্কার ও কাল্পনিক ঘটনার মূলোৎপাটন করেছে। তবে এগুলোর অস্থিত্বকে অস্বীকার করেনি। বরং যারা আল্লাহর যিকির করবে, আয়াতুল কুরসী এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত দুআ-কালাম পাঠ করবে, জিন-ভূত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

জিন, ভূত, প্রেত-পেত্নী, রাক্ষস এবং এ জাতিয় আরো যে সমস্ত গল্প শুনা যায় তার মধ্যে থেকে কেবল জিনের ব্যাপারেই কুরআন ও হাদীছে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কুরআনে সূরা জিন নামে একটি সূরাও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, জিনেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট আগমণ করেছে এবং কুরআন শুনে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। তবে জিনদের মধ্যে কাফের-মুশরিকও রয়েছে। তেমনি পাপী ও অত্যাচারীও রয়েছে।

অত্যাচারী, দুষ্ট এবং অবাধ্য জিনেরা মানুষের ক্ষতিও করে থাকে। তবে যারা নিয়মিত কুরআন পাঠ করে, আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষতি থেকে আশ্রয় চায়, সকাল-বিকাল ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতুল কুরসী ও চারকুল পাঠ করে, নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে, ঘুম থেকে উঠার সময়, বাথরুমে প্রবেশ করার সময় ও তা থেকে বের হওয়ার সময়, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময়, সফরে বের হওয়ার সময়, নতুন স্থানে অবতরণ করার সময়, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ও ঘরে প্রবেশের সময়, খাবার গ্রহণ করার সময় এবং আরো যেসব স্থান ও সময়ে নির্ধারিত দুআ পাঠ করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তা পাঠ করে, সেই সাথে মন ও শরীর পাক-পবিত্র রাখে, সর্বদা আল্লাহর স্মরণ মনের মধ্যে জাগরিত রাখে, দুষ্ট জিন ও শয়তান তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা। (আল্লাহই অধিক জানেন)

[6] - হুদায়বিয়ার বছর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহাইল বিন আমর আসল, তখন তিনি বলেছিলেনঃ سهل أمرنا অর্থাৎ আমাদের কাজ সহজ হয়ে গেছে। سهل অর্থ সহজ ও নরম। সুতরাং সুহাইলের নাম শুনেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল কিছু হবে বলে আশা করলেন। বাস্তবে তাই হয়েছিল। সুহাইলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং যুদ্ধের আশঙ্কা মুক্ত হয়।

[7] - ভাল নাম, ভাল কথা এবং ভাল কিছু দেখে বা শুনে ভাল কিছু কামনা করাকে নেক ফাল বলা হয়। এতে কোন অসুবিধা নেই। এটি মনুষ্য স্বভাবের সাথে খুবই সংগতিপূর্ণ। ইসলাম এর বিরোধীতা করেনি। বরং তা সমর্থন করেছে এবং ভাল নাম শুনে ভাল কিছু অর্জন হওয়ার আশা করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল নাম পছন্দ করতেন, দুনিয়ার সম্পদ থেকে নারী, সুগন্ধি, মিষ্টি, মধু, সুন্দর আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত, মধুর কণ্ঠের আযান পছন্দ করতেন। এমনি তিনি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী এবং উত্তম স্বভাব খুব পছন্দ করতেন। মোট কথা তিনি প্রত্যেক ভাল বস্তু এবং যা মানুষকে ভালোর দিকে নিয়ে যায়, তা পছন্দ করতেন।

[8]- আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ তিয়ারাহ। ইমাম আলবানী (রঃ) এই হাদীছকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ১৬১৯।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12076

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন